আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক জীবন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিভাগের অধিকর্তা (ডিন) প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রী দেবতোষ গুহের সঙ্গে একটি কথোপকথন।

আলোচনায় কণিক পালধি

১। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ছোটবেলায় গ্রাম বাংলার মধ্যেই বেড়ে ওঠা এবং দেশীয় শিক্ষার প্রভাব কীভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়?

উঃ এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে তখনকার শিক্ষার সূচনা ব্রিটিশদের হাত ধরে। তাই এখনকার মতো জটিলতার পথে না গিয়ে গুটিকয়েক সাধারণ বিষয় পড়ানো হতো। তাতে হয়তো পছন্দের বিষয়টির গভীরে যাবার সুযোগ ছিল। আর আচার্য জগদীশচন্দ্র ছোটো থেকেই হাতে কলমে কাজের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। উনি গ্রাম থেকে কলকাতার যে অঞ্চলে এলেন তার খুব কাছেই একটি পিতলের কারখানা ছিল। উনি অনেকটা সময় কাটাতেন সেখানে, লক্ষ্য করতেন কাজকর্ম। এ থেকেই ওনার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায়। এর প্রয়োগ উনি করেছিলেন যখন নিজেই পিতলের বা ব্রাসের তৈরি মাইক্রোওয়েভ ক্যাভিটি বানিয়েছিলেন।

২। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে দিকপাল প্রতিভা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এঁরা কীভাবে ওনাকে প্রভাবিত করেছেন?

উঃ আমাদের সবার জীবনেই তো পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পড়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বন্ধু। নিশ্চয়ই এঁদের দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ ওনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাঁকে প্রভাবিত করার জন্য ফাদার ল্যাফোর নাম করবো। ফাদার ল্যাফোর ছাত্র হিসেবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বাইরে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়ে। পরবর্তী সময়ে উনি যখন পদার্থবিজ্ঞানের এবং আরো পরে উদ্ভিদবিদ্যার যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন তখন তাঁর ছাত্রাবস্থায় শেখা হাতেকলমে কাজের অভিজ্ঞতাই সাহায্য করেছে। আজকের ভাষায় তাকে হয়তো মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হবে। আসলে উনি পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকেই আহরণ করতেন বিজ্ঞানের কলাকৌশল।

ফাদার ল্যাফো - ফাদার ইউজিন ল্যাফো বেলজিয়াম থেকে এদেশে এসেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষকরূপে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং আবহাওয়া-বিজ্ঞানে তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে।

৩। ওনার পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

উঃ প্রথমেই বলি যে, উনি কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে চাননি। যে কাজটি নিয়ে ওনার চিন্তাভাবনা শুরু হয় সেটি হলো বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েলের ১৮৬৪ সালে লেখা পেপারটির বিষয়বস্তু নিয়ে। তাতে দুটি তত্ত্বের অনুযান করা হয়েছিল। এক- তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের প্রবাহ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রোপাগেশন এবং দুই- আলোও একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ।

১৮৭৯ সালে ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুর পর মূলত ইউরোপে ওনার তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এখানে দুজনের কথা বলতেই হবে। বৈজ্ঞানিক ভন হেলমহোলটজের বার্লিনে থাকাকালীন গবেষণা এবং তাঁরই ছাত্র হাইনরিখ হার্জের ১৮৮৭তে কার্লসরুহেতে করা পরীক্ষায়, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রোপাগেশনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও হার্জের হাতেকলমে প্রমাণ প্রথমেই

জনপ্রিয়তা পায়নি।

হার্জ দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার কিছুদিন পরেই ১৮৯৪ সালে মারা যান। এরপরে তাঁকে নিয়ে তৎকালীন মিডিয়াতে কিছু লেখালেখি হয় এবং সেই সূত্রেই তাঁর কাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করে বলে আমার বিশ্বাস।

এই ১৮৯৪ সাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন দুজন বিজ্ঞানী ইতালিতে মার্কনি এবং ভারতে জগদীশচন্দ্র, হার্জের আবিষ্কার এবং ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী হন এবং দুজনে দুটি পৃথক ধারায় এগোন। মার্কনি ভাবেন যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের মাধ্যমে যদি বেতার যোগাযোগ বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন করা যায় তাহলে তখনকার দিনে জাহাজে অনেক দূর যাত্রার সময় খুব সুবিধা হবে। অপরপক্ষে জগদীশচন্দ্রের আগ্রহ ছিল কীভাবে ক্রমাগত তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমিয়ে এটা প্রমাণ করা যে আলোও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ।

এইভাবে এগোতে এগোতে দুজনেরই কাজে অপূর্ব সৃজনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। হার্জ প্রথম অ্যান্টেনার ধারণা দিলেও, মার্কনির হাতেই আজকের ভাষায় যাকে বলে অ্যান্টেনা ইঞ্জিনিয়ারিং, তা গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্র আবার ক্ষুদ্র তরঙ্গের সন্ধানে আজকের ভাষায় মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের সন্ধান পান। সুতরাং, আজকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ওনার কাজ নিয়ে যতটা হইচই হয়, সেটা ওঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না বলা যায়।

৪। এ বিষয়ে বলা উচিত যে, মার্কনিকে নিয়ে বাঙালিদের খুব রাগ। উনিই যেন জগদীশচন্দ্র বসুর কৃতিত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আপনার কী মতামত?

উঃ এই একটি ভ্রান্ত ধারণার শিকার শুধু বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষ। এর কারণ হয়তো অনেকেরই জগদীশচন্দ্র বা মার্কনির কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। পুরোটা বলতে গেলে একটু বিশদে বলতে হবে।

মার্কনির কথাই আগে বলা যাক। ১৮৯৪ সালে ২০ বছরের যুবক মার্কনি বোলোনা শহরে নিজের বাড়ির ছাতে টুকটুক করে কাজ শুরু করলেন কীভাবে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ানো যায়। তৎকালীন টেলিগ্রাফের কমিউনিকেশন ছিল ডট-ড্যাসের সমাহার। সেটাকেই বেতারে আনা ছিল ওঁর উদ্দেশ্য।

উনি একমনে কাজ চালিয়ে সাফল্য পেলেন ১৯০১ সালে। এই সাফল্য, আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলে আকাশছোঁয়া। তিনি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের কাজকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করার কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য।

এদিকে ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বসে জগদীশ চন্দ্র ভাবছেন যে কীভাবে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমিয়ে কমিয়ে আলোর যে ধর্ম প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি এগুলি প্রমাণ করা যায়। এতে উল্টোভাবে বলা যাবে যে আলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভেও আছে। তাহলে আলোও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক।

সেই সময় আরেকজন বিজ্ঞানী অলিভার লজ হার্জের কাজ আলাদাভাবে প্রমাণের একটা চেষ্টা করেন এবং ১৮৯৩ সালে তাঁর লেখা বইটি জগদীশচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছয়। এই বইটির সেই প্রথম এডিশনের একটি কপি আমার কাছেও আছে। তার পাতাগুলি এতো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে যে তাতে আর হাত দেওয়াই যায়না।

যাই হোক, ওনার এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমানোর প্রচেষ্টাই এক যুগান্তকারী বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিল। এতো ছোট তরঙ্গের জন্য যা যা দরকার, যানে তরঙ্গবাহী বা ওয়েভগাইড, তরঙ্গ প্রবাহক বা অ্যান্টেনা, নিরূপণ যন্ত্র বা ডিটেক্টর- এই সবই অত বছর আগে তিনি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে বানিয়ে ফেললেন। তিনিই প্রথম, আজকে আমরা যাকে হর্ন অ্যান্টেনা বলি তা আবিষ্কার করেন ১৮৯৭ সালে। পরে অবশ্য ১৯৩৮ সালে ইঞ্জিনিয়ার উইলমার ব্যারো এই হর্ন অ্যান্টেনার আধুনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে ডিজাইন বানিয়ে পেটেন্ট করেন।

এইভাবে অমানুষিক প্রচেষ্টায় উনি মাইক্রোওয়েভ-চালিত সম্পূর্ণ যন্ত্রটির সাহায্যে নিখুঁতভাবে মেপে ফেললেন কোয়ার্টজ ক্রিস্টালের প্রতিসরাঙ্ক (রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স)।

আমরা ল্যাবে আলো দিয়ে যা সহজেই মাপতে পারি। এই গবেষণা রয়াল সোসাইটির বিখ্যাত গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হবার পর চারিদিক আলোড়িত হয়ে গেল। এই বিষয়ে ওনার বাংলা লেখাতেও কিন্তু উনি এই ঘটনাকে 'অদৃশ্য আলো' হিসেবে বলছেন। অর্থাৎ ওনার মাথায় সেই আলোর ধর্ম প্রমাণ করাই ঘুরছে তখনো।

এরপর উনি আরো এক ধাপ এগোলেন। উনি এই মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে কলকাতার টাউনহলে দূর থেকে একটি রিভলবারকে ট্রিগার করাতে সক্ষম হন। মানে দূর থেকে বন্দুক চালান, শব্দভেদী বাণের যতো। ওনার এইসব কাজ সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল।

এবার আসা যাক, এই দুজনের মানে জগদীশ চন্দ্র ও মার্কনির কাজের মূল্যায়নে বাঙালির ক্ষোভের কারণে। ১৯০১ সালে যখন মার্কনি বেতার সংযোগের কথা ভাবছেন তখনো ডায়োড আবিষ্কার হয়নি। ডায়োড আবিষ্কার হয়েছে ১৯০৪ সালে এবং তা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়েছে আরো পরে। তাই ডিটেক্টর হিসেবে মার্কনি ব্যবহার করেন একটি কোহেরার (coherer) যাতে আসলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের কারণে তড়িৎ প্রবাহ হয়।

এই কোহেরারের একটি ডিজাইন মার্কনি পেটেন্ট করেন। আমেরিকান পেটেন্ট পাননি, ব্রিটিশ পেটেন্ট। কেন আমেরিকান পেটেন্ট পাননি তার কারণ অবশ্য অজানা। পরে দেখা যায় যে এই ডিজাইনটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নয়, কারণ তাঁর এক ইতালিয় বন্ধু যিনি নেভিতে কাজ করতেন তাঁর থেকেই উনি যন্ত্রটির একটা ধারণা পান। অর্থাৎ ইতালির নেভিতে এই যন্ত্রের একটা ডিজাইন প্রচলিত ছিল।

এইবার কলকাতায় বসে জগদীশচন্দ্রের নিজের বানানো কোহেরারের সঙ্গে এই ইতালিয় নেভির কোহেরারের একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়, হুবহু এক না হলেও। জগদীশচন্দ্রের বানানো কোহেরারটি ওনার অন্যান্য কাজের মতোই সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। একটি ইউয়ের মতো টিউবের মধ্যে মেটাল এবং মার্কারির কনট্যাক্টের মাধ্যমে যন্ত্রটি কাজ করে। ইতালির যন্ত্রটিও কিছুটা তাই। আবার মার্কনিও সেইটার অনুসরণ করেছিলেন বলে সেটিও কিছুটা এরকম। এটাই মূল বিতর্কের কারণ।

কেন এরকম হলো তা নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো যে, রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র বসু যখন নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন তখন তিনি তাঁর বানানো কোহেরার-সমেত মাইক্রোওয়েভ-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করেন। হয়তো এই সময়েই ওখানে কেউ ছিলেন যার মাধ্যমে ইতালিয় নেভি এই যন্ত্রের ধারণা পায় এবং একটু অন্যরকম করে বানিয়ে ফেলে। কিন্তু এর মানে কখনোই এটা নয় যে মার্কনির সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ ছিল। এমনকি জগদীশচন্দ্র নিজেও কখনো মার্কনির প্রতি কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। দুজনের চিঠিপত্রের আদান প্রদানে মধুর সম্পর্কের পরিচয়ই আছে। কেন যে এই বিতর্ক এখনো বর্তমান তার কারণ জানিনা!

৫। ব্রিটিশদের আমলে বিজ্ঞানে তো অর্থ পাওয়াই মুশকিল ছিল। তাও উনি কীভাবে এক্সপেরিমেন্ট করতেন? এ থেকে আমাদের কী শেখা উচিত?

উঃ এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে যেকোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। জগদীশচন্দ্রের আমলে তো অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি। আরো আগের ওহম বা অ্যাম্পিয়ারের আমলে তো অনেক কিছুই নিজেদেরই মাথা খাটিয়ে বার করতে হতো। ফলে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন সবসময়ই ছিল। থাকবেও।

আগেকার দিনে এই ধরণের কাজে অর্থের যোগান দিতেন রাজা-মহারাজা-জমিদার এঁরা। পোশাকী নামে যাঁদের আমরা প্যাট্রন বলি। এছাড়াও অনেক বিজ্ঞানের কাজ ব্যক্তিগত অর্থেও করা হয়েছে। এই অর্থের যোগান এবং তা থেকে উৎপন্ন ফসল মানে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের আইনি অধিকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে মতবিরোধও হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের অনেক কাজে সিস্টার নিবেদিতা ও বিবেকানন্দও সাহায্য করেছেন। তখন ব্রিটিশদের সহায়তা গবেষণার জন্য কম ছিল।

পরবর্তীকালে আমাদের সময়ে অর্থের জন্য এসেছে সরকার। এবার সরকারের কাছেও সবসময়ই অর্থ পাওয়া

না গেলে আমাদের সহযোগী বা কোলাবরেটর খুঁজতে হবে। এদেশে না হলে বিদেশে খুঁজতে হবে। তবে সেই সময়ের নিরিখে বলতে পারি যে গবেষণার কাজে অর্থই একমাত্র অন্তরায় নয়, এটাই আমাদের শেখা উচিত।

৬। উনি পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও জীববিজ্ঞানেও আধুনিক গবেষণার সূচনা করেছিলেন। আজকের যুগে আমাদের কাজ অনেকটা স্পেশালিস্টদের মতো। সেই সময়ে এত বিভিন্ন বিষয়ে কাজের গুরুত্ব নিয়ে যদি আলোচনা করেন তো বুঝতে সুবিধা হবে।

উঃ এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে উনি যতো বিষয়ে কাজ করেছেন তা বিস্মিত করে। আগেকার দিনে গ্যালভানি এবং পরবর্তী সময়ে জগদীশচন্দ্রই আছেন, যাঁরা উদ্ভিদের ওপর পদার্থবিজ্ঞানের এইরকম প্রয়োগ করেছেন। জগদীশচন্দ্র প্ল্যান্টের ওপর যতরকম পরীক্ষা চালিয়েছেন, যতরকম যন্ত্রপাতি বানিয়েছেন তার থেকে বলাই যায় যে তিনি এই বিষয়ের পথপ্রদর্শক। আজকে যখন আমরা বায়ো-ইলেকট্রনিক্স, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং এইসব শব্দ শুনি তখন আমার ওনার ভুমিকাই মনে পড়ে। উনিই হয়তো পৃথিবীর প্রথম সারির দু-তিনজনের মধ্যেই থাকবেন যাঁরা এত বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন।

৭। সব শেষে জানতে চাইবো, কেন এখনো তাঁর কাজ নিয়ে আলোচনা হয়? তাঁর কাজগুলির বর্তমান গবেষকদের কাছে গুরুত্ব কতটা?

উঃ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে জগদীশচন্দ্র অনেক কিছুতেই প্রথম। আগে যা বলা হয়েছে তা বাদ দিলেও বলা যায় তিনিই প্রথম ভারতে কীভাবে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দেশীয় প্রযুক্তিতে বানানো যাবে তা দেখান। বিশেষত ডিটেক্টর বানানোর ব্যাপারে তাঁর নৈপুণ্য অসাধারণ।

দ্বিতীয়ত, তিনিই প্রথম মেটামেটিরিয়েলের ধারণা দেন। মেটামেটিরিয়াল আসলে কোনো মেটিরিয়াল বা পদার্থ নয়, লোহা তামার মতো। এটা আসলে একটা স্ট্রাকচার বা পদার্থের বিন্যাস। এই বিন্যাসের মাধ্যমে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের পরিবর্তন হতে পারে তার ধারণা দিয়েছিলেন উনি।

তৃতীয়ত, সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে এই যে দেয়াল আছে, এটা ফিজিক্স, ওটা কেমিস্ট্রি বা বায়োলজি, এটাও উনি মুছে দিয়েছিলেন নিজের কাজে।

চতুর্থত, উনি সেসময়ই বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনা করে অসরকারি সংগঠনের বিজ্ঞানে নিবেশ করার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বুঝিয়েছেন। আজকে সেই সংস্থা সরকার অধিগ্রহণ করেছে। তবে ভারতে এখন অনেক প্রাইভেট সংস্থা গড়ে উঠছে। তারা জগদীশচন্দ্রকে অনুসরণ করতে পারে।

এরকম বিজ্ঞানী কয়েক শতকে বা সহস্রাব্দে একজনই আসেন। বাঙালি বা ভারতীয় শুধু নয়, আমার মতে সারা বিশ্ব তাঁকে নিয়ে গর্বিত হতে পারে, স্মরণ করতে পারে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শ্রীপালধি: বর্তমানে অধ্যাপনারত ফলিত আলোকবিজ্ঞান ও আলোকণাতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়